



সুরাইয়া খানম
সমগ্র .



ভূমিকা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সুরাইয়া খানম তাঁর একটি কবিতার নাম রেখেছেন, ‘আমি আজও সম্পূর্ণ সুরাইয়া হয়ে উঠিনি’; তাঁর এই উক্তি সত্য আছে এই অর্থে যে তিনি থেমে থাকেননি, এগিয়ে গেছেন; তবে তাঁর ওই উক্তি যে যথার্থ সেটাও বলার উপায় নেই; কেননা একেবারে শুরু থেকেই তিনি নিঃসন্দেহে সুরাইয়া খানমই। তাঁর যে কোনো রচনা পড়লেই বোঝা যাবে যে সেটি ভিন্ন রকমের; কথা সেখানে অন্য ধরনের, অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন স্বতন্ত্র, এবং রচয়িতার তৃষ্ণাও তাঁর একেবারেই নিজস্ব। সুরাইয়ার কবিতার বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য আছে। অনেক রকমের এবং নানান ধরনের বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন, এবং যা-ই লিখেছেন তাতেই তিনি মৌলিক। সুরাইয়ার কবিতা তাঁর জীবনেরই অংশ। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, কবিতা তিনি লিখেছেন না-লিখে উপায় ছিল না বলে। কেউ যে উৎসাহ দিয়েছেন বা অনুপ্রাণিত করেছেন তা নয়; বরং বিরোধিতাও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে— বাইরে থেকে যেমন, তেমনি পরিবারের ভেতর থেকেও। কিন্তু তিনি ছিলেন অদম্য, কারণ তাগাদাটা এসেছে একেবারে ভেতর থেকে; তাঁর নিজের ভাষায়, না লিখলে “মাথা ধরে, অসহায় বোধ হয়, দম বন্ধ হয়ে আসে।”

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সাফল্য ছিল; কষ্টও ছিল। কষ্টের অমরতার উল্লেখ রয়েছে তাঁর কবিতায়। বেদনা থেকেই তিনি লিখেছেন। আসলে সেটিই ঘটে; কবিতা তো অবশ্যই, সকল শিল্পসৃষ্টিরই উৎস হচ্ছে শিল্পীর নিজের অন্তর্গত বেদনা ও অসন্তোষ। সুরাইয়া খানম বেদনায় পিষ্ট ছিলেন। পীড়িত ছিলেন তিনি অসন্তোষেও। তাঁর লেখায় আত্ননাদ আছে, কান্নার পূর্ব-মুহূর্তও পাওয়া যাবে; কিন্তু কান্না নেই, কারণ জীবনে যেমন কবিতাতেও তেমনি, তিনি ছিলেন দুর্দমনীয় রূপে আশাবাদী।

এক অর্থে তাঁর সকল কবিতাই আত্মজৈবনিক। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছেন, সেখানে মিথ্যার বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় নেই। কবিতাতেই তো বলেছেন তিনি যে মিথ্যা বললে কথারা কলঙ্কিত হয়। অমন কলঙ্ক তাঁর রচনাকে স্পর্শ করেনি। অন্যদিকে নেই বাগাড়ম্বর। উচ্চারণ যেখানে মর্মস্পর্শী, ব্যথার ভারে কাতর, সুরাইয়া খানম সেখানেও সংযত এবং নান্দনিকতা-বোধে সুশাসিত।

একই সঙ্গে তিনি অনিবার্যরূপে আন্তরিক। আন্তরিকতা শিল্পের জন্য খুব বড় একটা মূলধন। ওই বস্তুতে এই কবির রচনা আগাগোড়া সমৃদ্ধ। কিন্তু কেবল আন্তরিকতাই

যে শিল্প সৃষ্টি করে তা তো নয়, প্রয়োজন হয় মেধার এবং আবেগের। সুরাইয়া খানমের মেধা যেমন তাঁর শিক্ষার্থী-জীবনের ঈর্ষণীয় সাফল্যে দেখা গেছে, তেমনি তা কার্যকর ছিল তাঁর সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রেও। দেশী-বিদেশী ধ্রুপদী এবং আধুনিক সাহিত্য তিনি অনবরত পাঠ করেছেন; এবং পাঠের অভিজ্ঞতা যথাযথ রূপে কাজে লাগিয়েছেন। অদম্য আবেগ এবং সক্রিয় মননশীলতা একত্র হয়েছে—যেমন তাঁর জীবনচর্চায় তেমনি সাহিত্যসৃষ্টিতে। আর ছিল শ্রম। শ্রম ছাড়া যে সৃষ্টি নেই, এবং সৃষ্টিতে যে উল্লাস রয়েছে, এই দুই খবরই সুরাইয়া খানমের লেখার ভেতর পাওয়া যাবে। রচনার সাবলীলতা ও সজীবতা দেখে মনে হবে যে এরা স্বতঃস্ফূর্ত। হ্যাঁ, স্বতঃস্ফূর্তই বটে। কিন্তু পেছনে আছে শ্রম। ওই শ্রমের কারণেই বক্তব্য নান্দনিক হয়েছে। তিনি জানতেন যে রোম শহর একদিনে গড়ে ওঠেনি; বাগানের ফুলও রাতারাতি ফোটে না; সেই সচেতনতা যে তাঁর সৃষ্টিশীলতার ভেতরেও ছিল সেটা টের পাই তাঁর লেখার সংগঠনে ও সৌকর্যে। যথার্থ শব্দের তিনি যথাযথ ব্যবহার করেছেন; পুরাতন শব্দকে নতুন করে তুলেছেন, অপরিচিত শব্দকেও সামনে নিয়ে এসেছেন। প্রয়োজনে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারেও দ্বিধা করেননি। অনেকসময়েই তাঁর ভাষা গানের মতো; আবার বিদ্রূপ, এমনকি ধমকও যে নেই, এমনও নয়; কিন্তু সে-ভাষা সকল সময়েই সুশ্রাব্য। কখনোই কৰ্কশ নয়।

সব মিলিয়ে সুরাইয়া খানমের নিজের একটি জগৎ ছিল, সেটি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেরই সম্প্রসারণ, এবং সে জন্য মোটেই কৃত্রিম নয়, পুরোপুরি স্বাভাবিক। তাঁর ওই জগতে প্রধান সত্য মমতা। তিনি জানেন এবং কবিতার মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, মানুষ মাত্রই মমতা অভিলষী। এই মমতাই তাঁকে অবিচলিত ও সক্রিয় রেখেছে। তাঁর কবিতার জগৎটি ওই মমতার কারণেই বিশেষ ভাবে জীবন্ত। সুরাইয়ার ওই জগতে বিষণ্ণতা রয়েছে, কিন্তু হা-হুতাশ নেই। কবিতাকে তিনি মনে করেন ‘সমাজদেহের অন্তর্গত চিৎকার’; কিন্তু সে চিৎকার বিলাপের নয়। তিনি লিখেছেন,

আমি এক জলার্ত চিৎকারে ফাটি, বজ্র চাই,
সৃষ্টি চাই, তরবারি চাই
তোমরা শুধু দেখলে হাহাকার।

(‘ভিন্ন দৃষ্টি’)

ব্যক্তিগতভাবে আমরা যাঁরা তাঁকে চিনতাম তাঁদের জানা ছিল তিনি কাজেকর্মে-কথাবার্তায় কেমন সপ্রতিভ ছিলেন। ওই সপ্রতিভতা তাঁর কবিতাতেও রয়েছে। কিন্তু এটা তিনি জানতেন যে, সব কথা সহজে কথা হয় না। জীবনকালে প্রকাশিত তাঁর একমাত্র কবিতার বইটির তিনি নাম দিয়েছিলেন ‘নাচের শব্দ’। ওই নামকরণ বড়ই যথার্থ। তাঁর কাব্যে শব্দ আছে। বস্তুত তাঁর কবিতার জগৎটি শব্দে মুখরিত। কিন্তু সে মুখরতা হট্টগোলের অট্টরোলের নয়; সেটি গানের। তাঁর কবিতার শিরোনামে দেখি বার বার গান ফিরে ফিরে আসে, এবং কবিতার ভেতরেও গান উপস্থিত থাকে। সেই

পথে রোদ, পথে ধূলো, পথে তীক্ষ্ণ ঝড়ের গিটকিরি
পথে ষ্ণেদ, পথে খেদ, পথে দীর্ঘ কঙ্কালের সারি
পথে ক্রোধ প্রতিশোধ প্রেতাআর আহাজারি ভারি

এগুলো সবই অবাস্তব, কিন্তু যা তিনি ভীষণভাবে ঘৃণা করেন সেটি হলো প্রতারণা।
খঞ্জকে তিনি খঞ্জ বলেন না, খণ্ডকে বলেন না খণ্ড, অন্ধকে বলেন না অন্ধ; কিন্তু
ভণ্ডকে বলেন ভণ্ড। তাঁর জগতে হলদে লতাও কথা বলে; কবির পক্ষ হয়ে জানায়
“জড়ভরত নিমকহারাম ঝুঁয়োপোকা পিঁপড়ে যত/কামড়ে আমায় খেয়েছে, বুকে
আমার ক্ষত”। নিজে তিনি জানেন বাঁচতে হলে খাজনা দিতে হয়; হিসাব মিলাতে
গিয়ে দেখেন হাতে কিছু নেই; চলতে গিয়ে টের পান পথে বিছানো রয়েছে মোহ,
মোহ থেকে মুক্তির জন্য চাই শক্তি। প্রেমিককে বিশ্বাস করেন না, জানেন সে-লোক
পদ্মপুকুরে সাঁতার কাটতে আসে, উঠে চলে যাবে বলে। তিনি আশ্রয় চান, দরকার
মনে করেন শুষ্কশালয়ের; কিন্তু জানেন তা পাবেন না। তবু আশা রাখেন মানুষের
মনুষ্যত্বে। এবং এটাও জানেন যে, রোম শহর একদিনে গড়ে ওঠেনি, পুষ্পও
রাতারাতি ফোটে না। আস্থা আছে তাঁর নিজের ওপর। এবং সে কারণে তিনি কেবল
আত্মবিশ্বাসী নন; আত্মশ্রদ্ধাশীলও। শ্রদ্ধা করেন নিজেকে। আর ছিল জেদ। যেটি না
থাকলে শুরুতেই থেমে যেতে হতো।

বিদ্যমান ব্যবস্থাটা যে পুঁজিবাদী তা তিনি জানেন; যদিও সে-ভাবে তাকে চিহ্নিত
করেননি। তিনি বাণিজ্যওয়ালাদের বিরুদ্ধে, যাদের আচরণ মাংসবিক্রেতা কসাইয়ের
মতো। তাই তিনি বিদ্রোহ করেন, দেয়ালগুলো ভেঙে ফেলতে চান। তবে তাঁর
বিদ্রোহ ভিন্নধর্মী। সেটা মমতায় পরিপূর্ণ। সুরাইয়া খানম লিখছেন, বিদ্রোহ শুধু
‘বীরভাবে’ ঘটে না; তার জন্য আরও কিছু উপাদান প্রয়োজন। তাঁর উপলব্ধিটা এ
রকমের যে, বিদ্রোহের জন্য দরকার হয় সেবার, আত্মত্যাগের, মহান প্রেম-প্রীতির
এবং বিশ্বাসের। বিদ্রোহ শুধু ঠোকাঠুকি নয়; বিদ্রোহে ‘ব্রহ্মকৃষ্ণের শিখা’র পাশাপাশি
থাকে সংযোজন ও সংগঠন, এবং সেই সঙ্গে ‘ক্ষমার ঢেউ’। তাই তিনি বলছেন,
“লিপিকার আমি, অস্ত্র তুলি লিখিলাম আমি/ঐক্যের কবি মানুষ মমতার
অভিলাষী।” ক্ষমতার নয়, কর্তৃত্ব চান তিনি মমতার।

এই সংগ্রামে তিনি প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত :

যে পারে পারুক নিক পেতে বুক দাসত্বের এই ছররা
যে পারে করুক গানি ভুলবার হল্লা,
যে পারে তুলুক মুখোশ ও দাঁড়িপাল্লা,

আমার তো আছে অমল ধনুক, অনড় শপথ
হারিকিরি, শুধু হারিকিরি কোরে মরবার।

(‘হারিকিরি শপথ’)

২.

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সুরাইয়া খানম প্রশ্ন করতে ভালোবাসেন; এবং তাঁর প্রশ্নের ভেতরেই উত্তর থাকে প্রশ্নের জবাব। এ ছিল তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের একটি পদ্ধতি। পদ্ধতিটা নাটকীয়। নাটকে দ্বন্দ্ব থাকে, থাকাটা অপরিহার্য; সুরাইয়ার কবিতাতেও দ্বন্দ্ব পাবো, সে-দ্বন্দ্ব নাটকীয় বটে, কিন্তু কখনোই, ভুলেও, অতিনাটকীয় নয়। প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যের দ্বন্দ্বিকতাকেই প্রকাশ করতে চাইতেন। প্রশ্নের পাশাপাশি রয়েছে সম্বোধন। পাঠককে তো বটেই, নিজের অনুভূতিকেও তিনি সম্বোধন করেন। ফলে অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতার একটি পরিবেশ তৈরী হয়, এবং পাঠকের কৌতূহলও জেগে ওঠে পরিণতিটা জানবার জন্য।

সুরাইয়া খানম কবিতা লিখেছেন যেমন মুক্তহৃদে তেমনি অন্ত্যমিলযুক্ত পণ্ডিত্যেও, এবং তাঁর সকল কবিতাতেই অন্ত্যমিল রয়েছে, শব্দের পাশে শব্দরা বসে নিজেদের মধ্যে ধ্বনিগত সমন্বয় সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর কখনো উচ্চতামের নয়, সেটি কথোপকথনের। ওদিকে তাঁর বাইরের জগৎটা তো অতিনাটকীয় হয়ে উঠেছে, সেখানে হৈ চৈ চলে, উচ্চকণ্ঠে হুঙ্কার শোনা যায়, আত্নাদও ভেসে আসে; সে-জন্য তাঁর কণ্ঠস্বরের পক্ষে জায়গা খুঁজে পাওয়াটাই কঠিন হয়ে পড়ে। আবার তিনি যদিও যাত্রী ছিলেন সর্বদাই, কিন্তু সঞ্চয়ী ছিলেন না কখনোই; যে জন্য তাঁর অনেক লেখাই অগ্রস্থিত অবস্থায় ছিল। ইসরাইল খান একটি ভালো কাজ করেছিলেন, অনেক পরিশ্রম করে তিনি ২০২৩ সালে সুরাইয়া খানমের কিছু অগ্রস্থিত কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। সেটা ছিল একটা জরুরী কাজও। কিন্তু তাঁর সংগ্রহেও কিছু কবিতা এবং অন্যান্য রচনা বাদ পড়ে গিয়েছিল। মুহিত হাসানের সংকলন ও সম্পাদনা সমগ্র সুরাইয়া খানমকে উপস্থিত করার অসমাপ্ত কাজটিকে সমাপ্ত করেছে। অগ্রস্থিত কবিতার সঙ্গে তিনি নয়টি অনুবাদ কবিতা, চারটি গদ্যরচনা এবং চারটি সাক্ষাৎকার উদ্ধার ও সংযুক্ত করেছেন।

সুরাইয়া খানম স্মরণযোগ্য কবি ও লেখক, তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবার ব্যাপারে মুহিত হাসান যে শ্রম, মনোযোগ ও সময় দিয়েছেন যে কোনো মাপকাঠিতে তা অসামান্য। প্রকাশনা সংস্থা কবি প্রকাশনী ‘সুরাইয়া খানম সমগ্র’ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে একটি প্রয়োজনীয় ও জরুরী কর্তব্য পালন করেছেন। সংকলন-সম্পাদক মুহিত হাসান এবং কবি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী সজল আহমেদকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

প্রবেশক

বাংলাদেশের সাহিত্য-পরিমণ্ডলে ব্যক্তি সুরাইয়া খানম (১৩ মে, ১৯৪৪-২৬ মে, ২০০৬) সম্বন্ধে যত কথা ও কলহাস্যের ফোয়ারা ছুটেছে, সে তুলনায় তাঁর কবিতা কিংবা অপরাপর সাহিত্যকীর্তি বিষয়ে আলোচনা দুর্ভাগ্যজনকভাবে কম; প্রায় শূন্যও বলা চলে। স্বদেশি পাঠক ও সাহিত্য-অনুরাগীদের বেশির ভাগই সুরাইয়ার কথা স্মরণে আনেন তাঁর কবিতার জন্য নয়, বরং আড্ডার হালকা চালের চটুল গল্পগাছা থেকে উদ্ভূত তাঁর কতিপয় ক্লিশে কল্প-প্রতিকৃতির কারণে। তাই সুরাইয়া খানম এখনও বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে শুধুই ‘আবুল হাসানের প্রেমিকা’ কিংবা কখনো-সখনো ‘আহমদ ছফার উপন্যাসের চরিত্র’ হয়ে থেকে গিয়েছেন।

কিন্তু সুরাইয়া খানম আমাদের এক মহান কবির ‘অনুপ্রেরণার উৎস’ নিছক নন, নন কোনো কথাকারের উপন্যাসের চরিত্রের নেপথ্যে থাকা প্রেরণামাত্র। ইতিহাস-গবেষক লরি জিমার সম্প্রতি *I'm Not Your Muse* (রাইনিং প্রেস, ২০২৫) শীর্ষক এক অভিনব গ্রন্থে তুলে ধরেছেন সেইসব নারীর কথা, যাঁরা জনপরিসরে ও কেতাবি ইতিহাসে স্রেফ কোনো খ্যাতনামা পুরুষ-প্রতিভার ‘মিউজ’ বা প্রেরণাদাত্রী হিসেবেই পরিচিত—কিন্তু তাঁদের নিজেদের অসামান্য প্রতিভা ও সৃজনকর্মের খবর হয় কালের ধুলোয় ঢেকে গেছে নয়তো নির্মম হাতে মুছে দেওয়া হয়েছে। বিপরীতপক্ষে, কোনো কোনো বিখ্যাত নারী-প্রতিভার সুখ্যাতির আড়ালে একইভাবে ধামাচাপা পড়েছেন তাঁর সৃজনদীপ্ত প্রেমিক কিংবা স্বামী। সুরাইয়া খানমকে নিয়ে তাই নতুনভাবে আলোচনার সময় এসেছে। না, কারও সাধনসঙ্গিনী হিসেবে নয়, কিংবদন্তির রূপেও নয়। খুঁজে নিতে হবে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ সুরাইয়া খানমকে। সারবত্তায় তথ্য-উপাত্তের বদলে মুখরোচক জনকল্পনায় গড়ে ওঠা সুরাইয়া খানমের যে পূর্বনির্ধারিত রহস্যময় মুখচ্ছবি আজও আমাদের সাহিত্যজগতের পোর্ট্রেট গ্যালারিতে পরম বিশ্বাসে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তা দূরে সরিয়ে এই মনীষার মুখেরথাকে দেখা দরকার নতুন চোখে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে, ১৯৪৪ সালের ১৩ মে যশোরে জন্ম তাঁর; পৈতৃক শিকড়ও সেখানে। কিন্তু বেড়ে ওঠার সময়ের অনেকটাই কেটেছে বরিশালে—পিতার সরকারি চাকরির স্থানিক বাধ্যবাধকতায়। সুরাইয়া খানমের সাহিত্যপ্রেমের নেপথ্যে পারিবারিক প্রেক্ষাপট কতটা ভূমিকা রেখেছিল, তা তাঁর নিজের বয়ানেই জানতে পারি। মা শওকত আরা খানম ও বাবা মো. বজলুর রহমান খান দুজনেই বই আর সাময়িকপত্র পড়তে ভালোবাসতেন; ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখার গুরু, ‘অঙ্ক

প্রকাশ পায় তাঁর একটি গদ্য, যা এখন অবধি প্রাপ্ত তাঁর সবচেয়ে পুরনো মুদ্রিত বাংলা লেখা। পরে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এবং বাংলা একাডেমির সাহিত্যপত্র *উত্তরাধিকার* কি সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়* দেখা মিলছে তাঁর তরতাজা সব কবিতার; কখনো আবার করছেন ভিনদেশি কবিতার বঙ্গানুবাদ। এর মধ্যেই কবি আবুল হাসানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও প্রণয়ের পর্বটি ঘটে যায়। যা পরে বাংলাদেশের সাহিত্যজগতে যুগ যুগ ধরে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠবে, নিটোল বাস্তবতা ছাপিয়ে নানান কল্পকথার ডালপালাও সৃষ্টি হতে থাকবে এই অপরূপ প্রেমোপাখ্যানটিকে ঘিরে। সেসব কল্পকথার কিছু স্বপ্নাতুর, কিছু কদর্য। ১৯৭৫-এর ২৬ নভেম্বর আবুল হাসানের করুণ অকালমৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগেই বেরিয়েছিল হাসানের তৃতীয় ও অন্তিম কাব্যগ্রন্থ পৃথক *পালঙ্ক*, যার উৎসর্গপত্রে নিরাভরণভাবে মুদ্রিত একটি অনিবার্য নাম শুধু—সুরাইয়া খানম। স্বদেশের অস্থির অবস্থা ও আবুল হাসানের প্রয়াণ-পরবর্তী বেদনার অভিঘাতমুখর কালপর্বেই—ঠিক এর পরের বছর, ১৯৭৬-এর জুন মাসে প্রকাশ পায় সুরাইয়া খানমের প্রথম ও একমাত্র কাব্যগ্রন্থ *নাচের শব্দ*। আর এর উৎসর্গপত্রে যথারীতি আরেকটি অনিবার্য নাম, একইরকম নিরাভরণ আকারে—আবুল হাসান। কাকতালীয়ভাবে, এই দুটি কাব্যগ্রন্থই প্রকাশ পেয়েছিল গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের সন্ধানী প্রকাশনী থেকে; দুটিরই প্রচ্ছদ ঐকেছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী।

নাচের শব্দ প্রকাশ পাবার পরপর সুরাইয়া খানমের কবিতা লেখা থেমে থাকেনি। জাতীয় দৈনিকের সাহিত্যপাতা, বিশেষ সংখ্যা কিংবা বারোয়ারি সাপ্তাহিক থেকে শুরু করে মফস্বলের লিটল ম্যাগাজিন—সর্বত্রই তাঁর কবিতা তখন প্রকাশ পাচ্ছে। কবিতা অনুবাদের কাজে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা—বিদেশি কবিতার বাংলা অনুবাদের পাশাপাশি বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদও তখন করেছেন। শহর ঢাকার জমজমাট কবিতাপাঠের অনুষ্ঠান কি জেলা পর্যায়ের মফস্বলীয় সাহিত্যসভা—তাঁর সরব উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে নানান পরিসরে। ১৯৮১-র শেষের দিকে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ পাবার পর সুরাইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাট চুকিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হন ১৯৮২-র প্রথমার্ধে। ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি পান। আরও পরে, ১৯৯৮ সালে ‘Gender and the Colonial Short Story’ শীর্ষক গবেষণাপত্রের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কিন্তু, দেশে আর ফেরা হয়নি তাঁর। উচ্চতর শিক্ষার এই দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হলে তিনি অ্যারিজোনার টুসান শহরে থেকে যান, ওই অঙ্গরাজ্যেরই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন বেশ কয়েক বছর। ভিনদেশে থিতু হলেও বাংলা ভাষায় লেখালেখি একেবারে থামিয়ে দেননি। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত কিছু পত্রিকায় তাঁর কবিতা ও গদ্য অনিয়মিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উত্তর আমেরিকার বাঙালি কমিউনিটি আয়োজিত সাহিত্য-শিল্প সংক্রান্ত সেমিনার, কবিতাপাঠের আসর ও বইমেলায় তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন বলেও জানা যায়। ২০০৬ সালের ২৬ মে টুসানেই ৬৪ বছর বয়সে প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় সুরাইয়া খানমের মৃত্যু হয়।

সংলাপ’ শিরোনামে আরও দুটি বই হতে পারে, এমনও বলেছিলেন (‘অপ্রকাশিত সুরাইয়া’; ১২ অক্টোবর ২০২২, *আজকের পত্রিকা*)। পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ কাব্যগ্রন্থগুলো সুরাইয়া খানম পরে গুছিয়ে যেতে আর পারেননি। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত একমাত্র কাব্যগ্রন্থ ও একমাত্র বই হিসেবে কেবলই *নাচের* শব্দ থেকে গেল।

নিজের নির্মাণ-সম্ভব কবিতাবইয়ের সংখ্যা নিয়ে স্বয়ং সুরাইয়া খানমই যা বলে গেছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে তাঁর অগ্রস্থিত কবিতার সংখ্যা নেহাত কম নয়। গবেষক ইসরাইল খান ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে জার্নিয়ান বুকস থেকে *নাচের* শব্দ-এর অন্তর্গত ৫১টি কবিতার সঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত তাঁর অগ্রস্থিত আরও ৩৩টি কবিতা যুক্ত করে নিজের সম্পাদনায় *সুরাইয়া খানমের গ্রন্থিত-অগ্রস্থিত কবিতা* শীর্ষক একটি সংকলন প্রকাশ করেন। সুরাইয়ার এতগুলো অগ্রস্থিত কবিতা পাঠকের সামনে আনার জন্য ইসরাইল খান আমাদের ধন্যবাদ অবশ্যই পাবেন। তা সত্ত্বেও বলতে হয়, ওই সংকলনটি সম্পাদনা ও বিন্যাসের দিক থেকে একাধিক দুর্বলতায় আক্রান্ত। অগ্রস্থিত পর্যায়ে কবিতাগুলো সাজানো হয়েছে প্রচণ্ড এলোমেলোভাবে, কালানুক্রম মানা হয়নি। প্রমাদকণ্টকিত ছাপাও পীড়া দেয়। উপরন্তু, ভূমিকায় ইসরাইল খান কিছু গুরুতর ভুল তথ্য দিয়েছেন। যেমন—সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত *সমকাল* পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধপূর্ব সময়পর্বে সুরাইয়া খানমের কবিতা ছাপা হয়েছিল, এ তথ্যের সারবত্তা নেই। খোদ ইসরাইল খানের বই পূর্ব বাঙলার সাময়িকপত্র : *প্রগতিশীল ধারা* ১৯৪৭-৭১-তে (বাংলা একাডেমি, ২০১৬) *সমকাল*-এর যে রচনাপঞ্জি লভ্য, সেই পঞ্জি সাক্ষ্য দিচ্ছে—পাকিস্তানি জামানায় ছাপা হওয়া পত্রিকাটির সংখ্যাগুলোর কোনোটিতেই সুরাইয়ার কবিতা প্রকাশ পায়নি। বাহাভরে দেশে ফেরার পর *সমকাল*-এ তাঁর কবিতা প্রকাশ পেতে শুরু করে।

৩.

উত্তরপ্রজন্মের কাছে সুরাইয়া খানমের কবিতার স্বাদ পূর্ণাঙ্গরূপে পৌছে দেওয়া ও তাঁর তাবৎ লেখালেখির একটি অখণ্ড (যতখানি আপাতত সম্ভব) আকর তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা নির্মাণ করেছি এই সংকলন, *সুরাইয়া খানম সমগ্র*। এখানে রইল *নাচের* শব্দ-এর ৫১টি কবিতা, *সুরাইয়া খানমের গ্রন্থিত-অগ্রস্থিত কবিতা* সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ৩৩টি অগ্রস্থিত কবিতা এবং এই সংকলনের সবিশেষ সংযোজন, সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া সুরাইয়া খানমের আরও ৩২টি অগ্রস্থিত কবিতা। মোটামুট সব মিলিয়ে এই সংকলনে একত্রিত হলো সুরাইয়া খানমের ১১৬টি কবিতা।

সুরাইয়া খানমের কবিসত্তার পাশাপাশি তাঁর অনুবাদক ও গদ্যলেখক পরিচয় অনেকটা প্রথমবারের মতো এ সংকলনে উপস্থাপিত হলো। ওয়ালেস স্টিভেন্স, ডি এইচ লরেন্স, পাবলো নেরুদা, ডব্লিউ এইচ অডেন ও লিওপোল্ড সোদার সেজ্ঞারের কবিতার সুরাইয়াকৃত বঙ্গানুবাদ নিঃসন্দেহে তাঁর মৌলিক কবিতার মতোই পাঠকদের

ভালো লাগবে। সঙ্গে আরও আছে তাঁর করা বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ— যথাক্রমে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও আলতাফ হোসেনের দুটি কবিতার। কবিতার পাশাপাশি সুরাইয়া খানম চমৎকার গদ্যও লিখতেন। আফসোসের বিষয়, তাঁর খুব বেশি গদ্য আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। তাঁর তিনটি ছোটবড় প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও একটি চিঠি রইল এই বইয়ের ‘গদ্য’ পর্যায়ে। সবশেষে আছে তাঁর চারটি চমৎকার সাক্ষাৎকার। সুরাইয়ার সাহসী মন, উচ্ছল চিত্ত ও অগাধ অথচ অস্থির পাণ্ডিত্যের পরিচয় এসব আলাপচারিতার মধ্যে স্পষ্ট ধরা পড়ে। পূর্বোক্ত কাব্যানুবাদগুচ্ছ, গদ্য চতুষ্টয় এবং চারটি সাক্ষাৎকার এতদিন অগ্রস্থিতই ছিল।

সুরাইয়া খানমের আরও কিছু কবিতা কিংবা অন্যান্য রচনা আমাদের সংগ্রহের বাইরে থেকে গেছে নিশ্চিতভাবেই। সাহিত্য-গবেষক ও পাঠকদের সহায়তা এক্ষেত্রে আমাদের কাম্য। ভবিষ্যতে সুরাইয়া খানমের আরও অগ্রস্থিত লেখা পেলে এ সংকলনের পরের সংস্করণে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করার আশা রাখি।

৪.

সুরাইয়া খানম সমগ্র-এর নির্মাণ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে কী কী সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা হয়েছে, তার একটা বিবরণ এখানে দেওয়া দরকার।

নাচের শব্দ কাব্যগ্রন্থটির ক্ষেত্রে আমরা অনুসরণ করেছি বইটির প্রথম সংস্করণের পাঠ। ইসরাইল খানের জোগাড় করা, সুরাইয়া খানমের গ্রন্থিত-অগ্রস্থিত কবিতা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ৩৩টি ‘পুরাতন’ অগ্রস্থিত কবিতা আমাদের সংগ্রহকৃত ‘নতুন’ ৩২টি অগ্রস্থিত কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে ‘অগ্রস্থিত কবিতা’ শিরোনামের একটি অংশে এখানে ছাপাবার কথা প্রথমে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু পরে দুটি পর্যায় আলাদাভাবে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ, এতে করে অগ্রজ গবেষকের শ্রমকে সহজেই আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যাবে। ইসরাইল খান সংগৃহীত অগ্রস্থিত কবিতাগুলোর বিন্যাস সুরাইয়া খানমের গ্রন্থিত-অগ্রস্থিত কবিতা বইতে যেভাবে ছিল সেভাবে অবশ্য এ সংকলনে রাখা হয়নি। এখানে কবিতাগুলো সাজানো হয়েছে প্রথম প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী। মুদ্রণপ্রমাদও যতটা পারা যায় শুধরে নেওয়া গেছে; নথিপত্র ঘেঁটে একটি কবিতার প্রথম প্রকাশের পূর্বে লিখিত সময়কাল সংশোধন করা হয়েছে। তবে পাঠকদের বুঝবার সুবিধার জন্য বর্তমান সংকলনে ইসরাইল খান সংকলিত কবিতাগুলো ছাপা হয়েছে ‘সুরাইয়া খানমের কবিতা’ শিরোনামের একটি বিভাগে, সূচিপত্রেরও অংশটির নাম ওভাবেই রাখা রয়েছে; স্রেফ বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য সুরাইয়া খানমের গ্রন্থিত-অগ্রস্থিত কবিতা বইটির নাম আমরা খানিক বদলে নিতে বাধ্য হয়েছি এ ক্ষেত্রে। আশা করি পাঠকেরা এ সিদ্ধান্ত ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমাদের উদ্যোগে প্রাপ্ত অগ্রস্থিত কবিতাগুলো রইল ‘অগ্রস্থিত কবিতা’ অংশে, যা যথারীতি সেখানে কালানুক্রমিক আকারে বিন্যস্ত হয়েছে। সুরাইয়া খানমের ব্যক্তিগত বানানরীতি যতটা পারা যায় অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছি।

আছেন স্বয়ং সুরাইয়া—কাব্যদেবীর প্রদত্ত অগ্নিপরীক্ষায় যিনি বারংবার পরিশুদ্ধ, শত
অযাচিত অপমান কাঁধে নিয়েও তিনি যেন নিজেই আর-এক জোন অব আর্ক—

...যখন জীবন কাঁটা রাখে তার পথে পথে
সে তখন পায়ের তলায় বিদ্ধ ব্যথা নিয়ে নতুন নিয়মে পুষ্পিত।

ভুল বোঝে লোকে, ভাবে গরবিনী অথবা অস্থির অভিমানী :
কিন্তু আমি জানি তার হাতের উপর কেন উড়ে আসে
আহত পাখির দল, মানুষ, মলিন চাষা, চিত্তকৃত প্রসূন!

ভিতরে বিশাল এক মমতাক্ষমতা, জানে যুঁইফুল মাটির তলায়
কিসের আবেগে বাড়ে—কতটুকু সান্ত্বনায় শিকড়প্রবাহে জাগে
পৃথিবীতে আজো সব ভালোবাসা, স্নেহ, প্রেম, শুভতা, শুভ্রতা।

নিজেই আহত : তবু লোকে ভাবে রয়েছে লুকোনো তার মুঠোর ভিতর
কালকেউটের বাঁপি, লোহার করাত, ছুরি, ঘাতকের বিষ!

সে তার সুন্দর পোড়ে আর ওরা ভাবে দেখো জ্বালালো আগুন!...

প্রিয় পাঠক—বাংলা কবিতার এই দুঃখিনী, নিঃসঙ্গ রাজকন্যাকে এবার আপনারা
আপন করে নিন।

মুহিত হাসান
৩০ জুন ২০২৫
রাজশাহী

লেন-দেন ৫৪
মোহন ৫৫
মোহক্ষরণ ৫৬
দরোজাটা কোথায় ৫৭
ও ঘূর্ণি ও জলোচ্ছ্বাস ৫৮
হলদে লতা ৫৯
খাজনা ৬০
ফেরিঅলা ৬১
সোনালি মাছ ৬২
পা ৬৩
বিলুপ্ত নক্ষত্র ৬৪
ইনটেরোগেশন ৬৫
আত্মলীনা ৬৬
হিসাব ৬৭
বুলন্ত পেরেক ৬৮
বাগান ৬৯
সেফটিপিন ৭০
প্রতিবাদ ৭১
নাচের শব্দ ৭২
দলিল ৭৩
পিতৃপুরুষ ৭৪
ভিন্ন দৃষ্টি ৭৫
গণৎকারকে বানৎকার ৭৬
মাতৃবন্দনা ৭৭

সুরাইয়া খানমের কবিতা [২০২৩]

হারিকিরি শপথ ৮৩
বিশ্বপিতার প্রতিকৃতি ৮৪
আমি আজও সম্পূর্ণ সুরাইয়া হয়ে উঠিনি ৮৬
শ্যাওলা জড়ানো কানে ৮৭
কবিতা এবং সংক্রমণ ৮৮
প্রতিদান ৮৯
তোমাদেরই ছেড়েদি আসন ৯০
কোনো কবিতা নয় ৯১
কালো মানুষের ক্বাসিদা ৯৩
তবু চাই ৯৪